বিনোদিনী দাসীর কবিতা : এক অন্য অনুভূতি

নীলাঞ্জন কুমার

১.

বাংলা কবিতার জগতে উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহিলা বহু কবি যেমন জনমানসে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন, তেমনি আরও অনেক কবি সুযোগ ইত্যাদির অভাবে লোকচক্ষু থেকে আড়ালে থেকে গেছেন, তাঁদের নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। এইসব ব্রাত্য কবিদের কবিতা যদি আমরা অনুসন্ধিৎসু হয়ে খুঁজে চলি তবে দেখতে পাব তার ভেতর থেকে অন্য অনুভূতি উঠে আসবে, যা হয়তো তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত মহিলা কবিদের থেকে কোনো অংশে কম নয়। যে-সব মহিলা প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত পরিবার থেকে উঠে এসেছেন তাঁদের ভাগ্যের ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়ে যাঁরা পতিতালয় কিংবা নাট্যমঞ্চ থেকে এসেছেন, তাঁরা যে কতখানি ঘৃণার পাত্র সমাজে তা সে সময়ের সামাজিক অবস্থান দেখলে বোঝা যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে যাদের প্রথমেই দু-মুঠো অন্নের জন্য ঘৃণিত পথ অবলম্বন করতে হয়, তাদের ভেতরেও যে সুকুমার প্রবৃত্তি আছে সে সন্ধান কে রাখবে! ঠিক এরকম এক ব্রাত্য কবি বিনোদিনী দাসী। তাঁকে যতখানি আমরা বাজারি গণিকা ও রঙ্গমঞ্চের 'নটী' হিসেবে জানি, কিন্তু তিনি যে অনবদ্য কবিতাও লিখে গেছেন তা প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকায় ও পুস্তকাকারে, সে খবর আমরা ক'জনে রাখি? তাঁর জীবন কাহিনি নিয়ে নাটক, ছায়াছবি ও মঞ্চসফল যাত্রাপালা তৈরি হয়েছে। দু:খের বিষয় যে, সেগুলিতে তাঁর সুকুমার বৃত্তির থেকে কলঙ্কজনক অধ্যায়গুলি সামনে আনা হয়েছে। বিনোদিনীর একমাত্র প্রামাণ্য জীবন কথা তাঁরই লিখিত 'আমার কথা' ১ম খন্ড (প্রকাশকাল : ১৩১৯ বঙ্গাব্দ)- তে আমরা তাঁর জীবনের অনেকটাই জানতে পারি। তাঁর জীবনের সার্ধশতবর্ষ পার হলেও তাঁকে নিয়ে দু-একটি ক্ষীণ উদ্যোগ ছাড়া সিরিয়াস কাজকর্মের সন্ধান পাইনি। যার ফলে তাঁর ওপর মানুষের আগ্রহ তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি।

বিনোদিনীর জন্ম আনুমানিক ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ১৪৫ নং বাড়িটিতে এক সহায় সম্বলহীন মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে। ছিলেন মাতামহী, মা ও দুই ভাই বোন। ভাই ছোট বয়সে প্রয়াত হন। তাঁদের পরিবার কতখানি হতদরিদ্র ছিল তার উদাহরণ তিনি নিজে তাঁর 'আমার কথা'-য় দিয়েছেন : 'আমার সেই সময়ের একটা কথা মনে পড়ে, আমার যখন বয়স বছর সাতেক তখন আমার মাতা কাহাদিগের কর্ম-বাড়ি গিয়া আমাদের জন্য কয়েকটি সন্দেশ চাহিয়া আনিয়াছিলেন। অনুগ্রহের দান কিনা, তাহাতেই দশ-পনেরো দিন তুলিয়া রাখিয়া, মায়া কাটাইয়া আমার মাতার হাতে দিয়াছিলেন, এখন হইলে সে সন্দেশ দেখিলে অবশ্য নাকে কাপড় উঠিত। আমার মাতা তাহা বাটীতে আনিয়া আমাদের তিনজনকে আনন্দের সহিত খাইতে দেন। পাছে সেই দুর্গন্ধ সংযুক্ত সন্দেশ শীঘ্র ফুরাইয়া যায় সেই জন্য অতি অল্প করিয়া খাইতে প্রায় অর্ধঘন্টা হইয়াছিল। এই আমার সুখের বাল্য কালের ছবি।' বিনোদিনী শুনেছিলেন যে তাঁর নাকি ছোট বয়সে বিয়েও হয়েছিল এক প্রতিবেশি বালকের সঙ্গে। তাকে তিনি কোনদিন স্মরণকালে দেখেননি। এভাবে দিন গড়াতে গড়াতে স্থানীয় সমবয়স্কদের সঙ্গে দুষ্টুমি খেলাধুলার মধ্যে বড় হতে শুরু করেন ও ১৮৭১ সালে তাঁর মাত্র ৮ বছর বয়সে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে (বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটার)-এ 'শত্রু সংহার' নাটকে দ্রৌপদীর সখী হিসেবে নাটকে যোগদান। তার পরের বছরই ওই থিয়েটারের পরবর্তী নাটক 'হেমলতা'য় নামভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ধীরে ধীরে বেঙ্গল থিয়েটার, ন্যাশনাল থিয়েটার ও সবশেষে স্টার থিয়েটারে সর্বমোট ৫০ টি নাটকে ৬০টি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ১৮৮৬ সাল অবধি। নাটকে মাত্র ১২ বছর থাকাকালীন তিনি হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গ রঙ্গ মঞ্চের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। এছাড়া নাটকের জন্য তাঁর অবদানও বিশেষ করে ভোলার নয়। বিদেশি ধারায় অভিনেত্রীদের সাজসজ্জা তিনিই প্রথম শুরু করেছিলেন, যে ধারা এখনও বহমান। তা ছাড়া অভিনয়কে ধ্যানজ্ঞান করার কারণে ও নাটকের

স্বার্থে তিনি অপমান, বঞ্চনা, অপরের রক্ষিতা হয়ে থাকার মতো কদর্যতা হাসিমুখে সহ্য করেছেন, যা এক বিরল উদাহরণ।

বিনোদিনী দাসীর ও মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ১৮৭৭ সালে তৎকালীন ন্যাশনাল থিয়েটারে (বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটার), যা স্থায়ী হয়েছিল তাঁর শেষ অভিনীত নাটক স্টার থিয়েটারে 'বেল্লিক বাজার' (১৮৮৬) পর্যন্ত। বলা বাহুল্য গিরিশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসার পর তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে এক অনন্যসাধারণ অভিনেত্রী হিসেবে দর্শকের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও গিরিশ ঘোষের অসাধারণ পরিচালনা ধীরে ধীরে তাঁকে কালজয়ী করে তোলে। অভিনয়ে থাকাকালীন গিরিশচন্দ্রের কাছে নাটক ছাড়াও সামান্য কিছু পড়াশোনা ও বিশেষ করে ইংরাজী শিখেছিলেন। যা পরবর্তীকালে পড়াশোনার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ, সেই সঙ্গে গিরিশ ঘোষের কাব্যশক্তিও তাঁকে অনুপ্রাণিত করে, যা তার কবিতা লেখার ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ বলে মনে করি। বিনোদিনীর বহু অসম্মান নিয়ে থিয়েটার ত্যাগ, এরপর জনৈক জমিদারকে বিবাহ করা ও স্বামীর মৃত্যুর পর আবার মাতামহের ঘরে ফিরে আসা তাঁর কন্যা শকুন্তলাকে সঙ্গে নিয়ে, পরবর্তীতে শকুন্তলার মৃত্যু তাকে ধীরে ধীরে একাকিত্বের দিকে ঠেলে দেয়। তাঁর প্রাত্যহিক জীবনচর্যা নিয়ে তাঁর বাড়ির একাংশের ২৯ বছর ধরে ভাড়াটিয়া হিসাবে বাস করেছেন এমন এক ব্যক্তির বংশধর, বিনোদিনী গবেষক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্যকে ২২.৯.১৯৬৪ তে এক পত্র লেখেন, যার অংশবিশেষ তুলে ধরা হল : "কতদিন বেঁচে ছিলেন, কোন সালে মারা যান তা — বাবু বলতে পারলেন না। তবে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। কাশীতে নয়, কলকাতাতেই উনি মারা গেছেন এমন বল্লেন। ওদের বাড়ীতে 'রূপবাণী' র পাশের রাস্তা ... তারাসুন্দরী ও বিনোদিনী পাশাপাশি বাড়ীতে থাকতেন। তারাসুন্দরী বিনোদিনীকে মাসি ডাকতেন ও খুব সোহাগ ছিল উভয়ত। ... যে বাড়ীটা —মহাশয় ২৯ বছর ভাড়া দিতেন সেই বাড়ীটা বিনোদিনীর ... বাড়ী

ভাড়ার রসিদ তিনিই সই করে দিতেন ও ভাড়ার টাকা নিতেন। নিজের মেয়ের নাম ছিল শকুন্তলা। তবে তাঁর পালিতা আরেক কন্যার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হয়, তারই সন্তান-সন্ততি এখন সেই বাড়ী ভোগ করছে। তিনটি ছেলে একটি মেয়ে সেই পালিত কন্যার ... দুটো বাড়ীর মাঝে একটি উঠোন নীচে, একটি ওপরে ছাতে ছিল। ... যাতায়াত তখনকার সময় বিনোদিনীর বাড়ীর সঙ্গে ... হতে পারতো না। তবে কখনও কখনও ভেতরের বা ছাতের দোর কর্ত্তাদের অজান্তে মেয়েরা খুলতো ও বিনোদিনীর ছাত্-এ খেলতো ... ওঁর শোবার ঘরে খুব উঁচু পালঙ্ক তাতে মই লাগানো, অনেক ফটো রঙিন ও সাদা কালো নানান সাজের। বিনোদিনী খুব ভালো গান গাইতেন অর্গান বাজিয়ে, খুব পুজোপাঠ হতো রামকৃষ্ণ গোপাল নারায়ণ শিলা এইসব নিয়মিত বামুন এসে পুজো করত। ... বিনোদিনী খুব সুশ্রী ... কিন্তু রং কালোই ছিল স্বাস্থ্য খুব ভালো — গলার জোর, সাহস এও খুব ছিল। খুব দয়াশীলা পরোপকারী ধার্মীকা রমণী ছিলেন।... ঈশ্বর প্রসঙ্গে অন্যান্য ভাল কথা কইতেন। তাঁর আত্মধিক্কার ছিল। গহনা পরতেন কানে গলায় হাতে কোমরে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের আশির্বাদ কেমন পেয়েছিলেন সে গল্পও করতেন। সর্বদা চটি পায়ে থাকতেন। শ্বেতী হয়েছিল কিনা ওনারা জানেন না ... বৃদ্ধ বয়সে বেশি সময় চুলের আঁটি (বেঁধে) বসে থাকতেন বারান্দায় ... রাগ হলে হাঁক দিয়ে গাল পাড়তেন। ভাড়াটিয়া বাড়ীর কর্ত্তারা ছেলেরা না থাকলে উনিই গার্জেন হতেন। ইংরাজী শিখেছিলেন। ঘরে বইও ছিল, দুটো বাড়ীর পার্টিশন ওয়ালে খুপড়ীতে বিস্তর পায়রা ছিল। তাদের নিজ হাতে চাল খাওয়াতেন। প্রত্যুৎমতি সম্পন্না ও মানুষ চিনতেন। সামান্য যা ওদের সঙ্গে গল্প করে জানা গেল লিখলুম। ... 'কনক ও নলিনী' ও একটি (কাব্য) আমার কথার আগের উনি লিখেছিলেন। ...'

বিনোদিনীর কাব্যগ্রন্থ 'বাসনা'-র (প্রকাশ : বাংলার ১৩০৩ সাল) আগে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় 'সৌরভ' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় (বাংলা ১৩০২ সাল) তাঁর তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়। যথাক্রমে 'হৃদয়রত্ন', 'অবসাদ' ও ২০ পৃষ্ঠব্যাপী কাহিনি কাব্য 'আভা'। আমরা এখানে উক্ত পত্রিকা সম্পাদক মহাকবি গিরিশচন্দ্রের প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে যদি দেখি তবে দেখা যাবে অভিনেত্রীদের প্রতি তাঁর মনোভাব : 'সভ্যসমাজে আমার স্থান আছে কিনা জানি না, জানিতে চাহি না, কারণ যৌবনের প্রথম অবস্থা হইতে, রঙ্গালয়ের উন্নতি উদ্দেশ্যে দৃঢ় সংকল্প হইয়া, জনসাধারণের উপেক্ষার পাত্র হইয়া আছি, সে যাহা হউক, অভিনেতৃবর্গ আমার চক্ষে, আমার পুত্র-কন্যার মতো সন্দেহ নাই। তাহাদের গুনগান, অপ্রকাশিত থাকে, আমার ইচ্ছা নয়। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কবিতা দুটি প্রকাশ করলাম।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম কবিতাটি 'হৃদয়রত্ন'(বিনোদিনী) ও দ্বিতীয় কবিতাটি 'প্রবাহের রূপান্তর' (তারাসুন্দরী)। 'হৃদয়রত্ন' কবিতাটি:

'এস হে হৃদয়ে এস হৃদয়রতন।
অনন্ত শূন্যেতে সদা করি অন্বেষণ।।
বাসনা বিবশ আজি খুঁজিয়া তোমায়।
তাইতে কাতর প্রাণ স্মরণ যে চায়।।
জ্ঞানময় চিদানন্দ চৈতন্যস্বরূপ।
বিরাজিত আছে যাঁর প্রতি লোমকূপ।।
হেরিব কোথায় সেই বিশ্বের চেতন।
পরমাত্মা জীবাত্মায় কোথায় মিলন।।
যোগময় কোন যোগে নিদ্রায় মগন।
স্বরূপ চৈতন্য কোথায় আছে অচেতন।।

ব্রহ্মময় ব্রহ্মরূপ কেমন মহিমা
উৎপত্তি বা লয় যাহা কোথা তার সীমা।।
কালস্রোতে ভেসে গিয়ে মিশে কোন জলে।
কালের মিশ্রিত জল স্থিতি কোন স্থলে।।
কোথা সে অনন্ত যার অন্তর নাই পাই।
কোথা জ্ঞানরূপ যাতে আপন হারাই।।
যাহাতে উৎপত্তি হয় তাহাতেই লয়।
কেমন আধার তাহা দেখি সাধ হয়।।'

বিনোদিনীর কবিতা আর অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। গিরিশচন্দ্রের 'সৌরভ' তিনটি সংখ্যার পরেই বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভবত বিনোদিনীর কবিতা লেখার ও প্রকাশের আগ্রহ এই পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের পর আরও সক্রিয় করতে সাহায্য করে। তার ফলে আমরা বাংলা ১৩০৩ সালে অর্থাৎ পরের বছর তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বাসনা' পেয়ে যাই। সে সময় বিনোদিনীর বয়স ৩৩ বৎসর, অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর সংশ্রব ত্যাগের ১০ বছর পর। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল তাঁর নিজ জননীকে। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৪, মোট কবিতা ৪১টি। যার ১৯টি কবিতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মল্য আচার্য সম্পাদিত 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা' (প্রকাশ : ১৩৭৬)-তে প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে উক্ত সম্পাদকদ্বয়ের বক্তব্যও তাৎপর্যপূর্ণ। '... শুধু অভিনেত্রী বলেই বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিনোদিনীর কবিতাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখার কোনো যুক্তি নেই। বাংলা সাহিত্যে সেকালের মহিলা কবিদের তুলনায় বিনোদিনীর কোনো কোনো কবিতা বোধহয় নিন্দনীয় নয়। বিনোদিনীর অভিনয়-প্রতিভার গভীরে একটি কবি প্রতিভাও বর্তমান ছিল, তারই প্রত্যক্ষ প্রকাশ এই কবিতাগুলির মধ্যে। বিনোদিনীর মানসিক প্রবণতা ও স্বভাবের চমৎকার প্রতিফলন এতে দেখা যাচ্ছে।' আমরা তার প্রমাণ পাই নিম্নোক্ত

কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলোতে :

'স্মৃতি লো বিষের জ্বালা দিও নাকো আর,
এ সংসারে চিরদিন কিছুই না রয়;
তবে কেন দু:খ তুমি দাও অনিবার।
তুমি মনে হলে প্রাণে জ্বালা অতিশয়।।'
('স্মৃতি' কবিতার অংশ)

'জানি হে পুরুষ জাতি নিঠুর নিদয়
থাকে যবে যার কাছে
যেন সে আমার আছে
অদর্শনে কোন কথা প্রাণে নাহি রয়।
যাও যাও প্রাণনাথ আদর এ নয়।।'
('সোহাগ' কবিতার অংশ)

'চাঁদেরে দেখিতে ভাল বাসিতাম বলে।
বলিতে সোহাগ ভরে শশী কথা কহ মোরে
গগনেতে শশী কিবা রয়েছে ভুতলে।।'
('অনুতাপ' কবিতার অংশ)

'যেন সে ঘুমের ঘোরে চমকে উঠে
চাইতো চারিধার।
দেখতো কাছে সদা আছে
মুখখানি কার।।

এখন যেন সেখান হতে যাচ্ছে চলে সে।
কি যেন প্রাণের কথা বলে গেল কে।।'
('কি কথাটি তার' কবিতার অংশ)

বিনোদিনীর কবিতা মগ্ন হয়ে পড়লে বুঝতে পারা যায়, তৎকালীন কবিতার নিরিখে তাঁর কবিতা উচ্চস্তরে পৌঁছোনোর প্রচেষ্টা নিয়েছিল। দুর্ভাগ্য যে তিনি এর পরেও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা সত্ত্বেও কবিতার দিকে আর নজর দিলেন না। তিনি যদি লিখে যেতেন তবে আমরা তাঁর কাছে আরও অনেক কিছু পেতে পারতাম। তার কবিতায় আছে ঈশ্বর চিন্তা, প্রেম, পুরুষ বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, জীবনের আক্ষেপ, প্রিয়জন হারানোর ব্যথা ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর ছন্দজ্ঞান ও শব্দচয়ন তৎকালীন বহু মহিলা কবির থেকে উচ্চস্তরের সন্দেহ নেই। কখনো-কখনো হয়তো তাঁর কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব ধরা পড়তে পারে, কিন্তু তাঁর সংযত উচ্চারণ ও আর্তি সে-সব ঢাকা দিয়ে দেয়।

বিনোদিনীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কনক ও নলিনী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১২ বঙ্গাব্দে। অর্থাৎ প্রথম কাব্যগ্রন্থের ৯ বছর পর। ৪৫ পৃষ্ঠার এই কাহিনি-কাব্যে তাঁর নামের জায়গায় "ন্যাশনাল ও স্টার থিয়েটারের ভূতপুর্ব অভিনেত্রী শ্রীমতি বিনোদিনী দাসী প্রণীত" লেখা হয়েছিল। তিনি উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন "আমার স্বর্গত ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালিকা কন্যা শ্রীমতি শকুন্তলা দাসীর উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তক অর্পিত হইল।" কাব্যগ্রন্থটি দুটি বালক-বালিকার মধুর সম্পর্ক ও তাদের শোচনীয় পরিণতি কেন্দ্রিক। গ্রন্থটির যে কিয়দংশ পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁকে দেখা যাচ্ছে তার 'বাসনা'-র থেকে এ গ্রন্থের কাব্যময়তা ও শব্দচাতুর্য আরও পরিণত। একজন পাকা রাঁধুনির মতো মিশিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন তাঁর যাবতীয় আবেগ ও মনন। অংশবিশেষ :

ক

'...ছুটিয়ে নলিনীবালা, ধরিয়ে পিতার গলা
বলে,—'পিতা কুটীরেতে আসিলে কখন?'
হাসিয়া তাপস কয়, 'এই কতক্ষণ হয়,
সবেমাত্র করিয়াছি সন্ধ্যা সমাপন।
বৃদ্ধ তাপসের তরে, কিছু আয়োজন করে,

না রাখিয়ে কোথা বাছা ছিলি এতক্ষণ ?

দেখ সন্ধ্যা হয় হয় , এখনও কি বনে রয়,

শিশির করিয়ে দিল সব আয়োজন।'

কনক কহিছে ধীরে, 'খুঁজিতে যে নলিনীরে,

রবি অস্তাচলে পিতা করিল গমন।।

পাখীদের গান শোনা, আকাশের তারা গনা,

এতক্ষণে নলিনীর হল সমাপন।

আমি খুঁজি বনে বনে, ছুটে ও হরিণী সনে,

বলি ব'ন ঘরে এস, না শুনে বচন।।

খ.

...

অস্তাচলে দিনদেব করিলে গমন।

কাতরে নলিনী মুদে কমল নয়ন।।

নদীর তীরেতে বসি কনক নেহারে।

'দিদিগো এস না ঘরে' নলিনী ফুকারে।।

থাকিতে দন্ডক দিবা কনক তখন।

নলিনে ডাকিতে বলে ঘরে এস ব'ন।।

এখন নলিনী খুঁজে কোথায় কনক।

সন্ধ্যা হয়ে গেল তবু না ভাঙ্গে চমক।।'

৩.

বিনোদিনী দাসীর কবিতা এই গ্রন্থটির পর না পাওয়া গেলেও তিনি কিন্তু আরও দীর্ঘদিন গদ্য লিখে গিয়েছেন। বিশেষত সেগুলি আত্মকথা-কেন্দ্রিক। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পত্রিকা 'নাট্যমন্দির'-এ তাঁর অসম্পূর্ণ আত্মকথা 'অভিনেত্রীর আত্মকথা,' ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৩১৯-এ 'আমার কথা—প্রথম খন্ড', ১৩২০-তে এই গ্রন্থের নব সংস্করণ 'আমার কথা ও

বিনোদিনীর কথা' নামে ও সর্বশেষ রচনা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'রূপ ও রঙ্গ'-তে বাংলা ১৩৩১-১৩৩২ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ আত্মকথা 'আমার অভিনেত্রী জীবন' প্রকাশিত হয়। এর পর তিনি কোনোদিন (মৃত্যু : ১৯৪১ খ্রি:) কলম ধরেছেন কিনা জানা যায় না। তাঁর নিষ্ঠুর ও নির্মম জীবন পর্বের বাইরে তাঁর কবিতার দিকটি জনমানস যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করলে তাঁর জীবনের সার্ধশতবর্ষ পরে তাঁর প্রতি শ্রেষ্ঠ উপহার প্রদান করা হবে।

তথ্যস্বীকার :

১। আমার কথা ও অন্যান্য রচনা। বিনোদিনী দাসী। সম্পাদক : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মাল্য আচার্য। সুবর্ণরেখা, কলকাতা-৯।